Rajshahi University journal of arts & law **ISSN 2309-0898 (Print)**
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 83-92 **ISSN 2408-8773 (Online)**
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0750

রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক পটভূমি (১৯৪৭-১৯৭১)
[Historical Background of Rajshahi District (1947-1971)]

আকিকুন নাহার*

Abstract

The period from 1947 to 1971 represents an era of profound transformation in the history of Bengal, the reflection of which is also clearly evident in regional history. In this context, an analysis of the historical landscape of Rajshahi district holds particular significance, as this region has long played a vital role as the administrative, economic, and cultural center of North Bengal. This article attempts a sharp observation of the evolution of the socio-economic, geographical, and administrative systems of the greater Rajshahi region in the post-1947 period. Alongside this, the obscure settlements of the present and whatever little exists have also been presented in the article. In other words, the present article endeavors to present the comprehensive history of Rajshahi district by analyzing its historical background, geographical and administrative evolution, and social and economic transformation during the aforementioned period and the time preceding it.

Keywords: Historical, Collector, Society, Culture, Rajshahi District.

ভূমিকা: ইতিহাস বিখ্যাত প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অন্যতম প্রধান একটি অঞ্চল রাজশাহী, যা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত দেশের বৃহত্তর একটি জেলা। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী একটি জেলা হিসেবে পরিচিত রাজশাহী জেলা। ইতিহাসবিদদের ভাষ্যে এই জেলাটির প্রাচীন নাম 'রামপুর বোয়ালিয়া'। প্রশাসনিক জেলা হিসেবে এ জেলাটির আত্মপ্রকাশ ১৭৭২ সালে। ১৯৭১ পূর্ববর্তী এবং ১৯৪৭ পরবর্তী রাজশাহী জেলার উত্তরে দিনাজপুর ও রংপুর জেলা, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা, বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা ও পদ্মা নদী, পশ্চিমে ভারতের মালদহ জেলা এবং পূর্বে বগুড়া ও পাবনা জেলা অবস্থিত ছিল। রাজশাহী জেলাকে 'পদ্মাবিধৌত অঞ্চল' বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই জেলার তিনটি উপজেলার অবস্থান পদ্মা নদীর তীরবর্তী। ইংরেজ আমলের ওহাবি আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সমৃদ্ধতর স্বতন্ত্রসংস্কৃতি, গৌরবোজ্জল সাংস্কৃতিক চর্চা, বহুমহাপুরুষ ও সাধকের লালনভূমি এবং দৃষ্টিনন্দন প্রাচীন স্থাপত্যকলায় ঐতিহ্যমণ্ডিত এ জেলাটির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

নামকরণ: রাজশাহী জেলার ভৌগলিক পরিচয় প্রদান পূর্বে রাজশাহী নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গ আলোচনা আবশ্যক বলে মনে হয়। এ সম্পর্কিত ইতিহাস পর্যালোচনায় দৃষ্ট হয় রাজশাহী নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষণীয়। কারণ উক্ত বিষয় অবলম্বনে প্রামাণ্য সহযোগে বস্তুনিষ্ঠ কোনো আলোচনা বা মতবাদ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে জনশ্রুতিমূলক নানা মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত আবুল ফজল রচিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে বা তার পূর্ববর্তী কোনো দলিলপত্রে রাজশাহী নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১] *আইন-ই-আকবরী* রচিত হয় ১৫৯০ সালে। অর্থাৎ ১৯৫০ সালের পরবর্তী কোনো এক সময়ে এ অঞ্চলটির নামকরণ করা হয় রাজশাহী।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নিউঃ গভ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ৬০০০, বাংলাদেশ; E-mail: hena24b@gmail.com

ইতিহাসবিদদের মতে, বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত (মহাস্থানগড়) ও বরেন্দ্র অঞ্চল এলাকা দুটি নিয়ে গঠিত প্রাচীন বাংলা জনপদ। তন্মধ্যে একটি বৃহত্তর জনপদ হচ্ছে রাজশাহী জেলা। গবেষকরা মনে করেন, রামপুর বোয়ালিয়া ছিল এ শহরের পূর্বনাম। 'রামপুর' ও 'বোয়ালিয়া' এ দুটি জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বর্তমান রাজশাহী শহর। হিন্দুদের দেবতা 'রাম' থেকে 'রামপুর' এবং ফারসি 'বু' অর্থ সুবাস এবং আরবি 'আউলিয়া' হতে 'বোয়ালিয়া' শব্দটি গৃহীত। যার অর্থ আউলিয়াদের সুবাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। সে সময় 'মহাকালগড়' নামে অভিহিত হতো সমগ্র রাজশাহী শহরাঞ্চল। অত্যাচারী সামন্তশ্রেণি দেও রাজাদের একটি জনপদ ছিল 'মহাকালগড়'। খেজুর চান্দ ধর্মভোজ এবং তার ভ্রাতা সামন্তরাজ অংশীদেও চান্দভণ্ডী ধর্মভোজ ছিলেন মহাকালগড়ের দেওরাজা।[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগমন একদিকে যেমন বাংলার ইতিহাসে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত, অন্যদিকে তেমনি ইসলাম প্রচারে বহু পীর-দরবেশ-আউলিয়ার সন্নিবেশ ঘটে। ১২৭৭ সালে (৬৭৭ হিজরি) বাগদাদ থেকে আগত তুরকান শাহ (রহ.) মহাকালগড়ে ইসলাম প্রচারকালে দেওরাজ ভাতৃদ্বয় দ্বারা তিনি এবং তাঁর সহচরগণ নির্মমভাবে শহীদ হন। রাজশাহী কলেজের ফুলার হোস্টেলের পেছনে তুরকান শাহ (রহ.) এর মাজার বিদ্যমান। এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ইসলামধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে ১২৮৭ সালে বাগদাদ থেকে মখদুমপুর (বর্তমান বাঘা) হয়ে মহাকালগড়ে আসেন দরবেশ শাহ মখদুম রুপোশ (প্রকৃত নাম সাইয়্যিদ আবদুল কুদ্দুস (রহ.)। তিনি ১২৮৭-১৩২৬ সাল পর্যন্ত পরপর তিনটি যুদ্ধে সামন্তরাজাদের পরাজিত করে মহাকালগড় জয় করেন এবং পদ্মা নদীর তীরে তাঁর আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন।[৩] ১৬৩৪ সালে রাজশাহীর কুমারপুরে দরবেশ আলীকুলী বেগ আগমন করেন। তিনি বর্তমান রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক ধরে রাজাবাড়ির সন্নিকটে অবস্থান করেন। হযরত শাহ মখদুম রুপোশের ভগ্নগ্রস্ত সমাধিসৌধটির গম্বুজ পুনর্নির্মাণ করলে এটি সর্ব সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলস্বরুপ বোয়ালিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। *ইতিহাসদৃষ্টে জানা যায়* তেরো শতকের শেষ দিকে এই তাপসকে ঘিরে রাজশাহী শহরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক সমাগম ঘটে। গবেষকরা মনে করেন, দরবেশ শাহ মখদুম রুপোশের আগমনের পর থেকে 'বুয়ালিয়া' বা 'বোয়ালিয়া' নামে পরিচিত হয়ে উঠে বর্তমান রাজশাহী শহর। ১৭৬৪-৭৬ সালে জেমস রেনেল প্রণীত বাংলার মানচিত্রে প্রথম দালিলিক প্রমাণ মেলে বুয়ালিয়া বা বোয়ালিয়া নামকরণটির। পরবর্তীতে রেনেল-এর মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় বোয়ালিয়া তথা পদ্মা তীরবতী শহর রাজশাহী।

১৬৬০ সালে ডাচ গভর্নর ভ্যানডেন ব্রুক এর মানচিত্রে 'বোয়ালিয়া' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার সাথে পাবনা, বগুড়া ও রংপুর অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ দেখা যায়। সড়কটি রংপুর হয়ে আসামের সীমানা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। সুফি-সাধক শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) এর পুনর্নির্মিত সমাধিসৌধকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তদের আগমন ঘটে। মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগত অভিবাসীরা এখানে বসতি স্থাপন করে। ইউরোপিয় বণিকদের আগমন ও রেশম কুঠি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক নদীবন্দর হিসেবে রামপুর- বোয়ালিয়া শহরের সূচনা হয়। ক্রমান্বয়ে এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রামপুর-বোয়ালিয়া শহরের নামকরণ রাজশাহী কিভাবে হলো তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মোগল সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম মন্ত্রী সাদ উল্লাহ খান যে প্রশাসনিক ইউনিটটি প্রথম গঠন করেন সেটি চাকলা নামে পরিচিত। আবার নওয়াব মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলাকে ১৩টি ভাগে বিভক্ত করেন ১৩ টি চাকলায়। এই বিভাজিত চাকলাগুলোর মধ্যে 'চাকলা-রাজশাহী' নামটির সন্ধান মিলে।[৪] নওয়াব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামল ১৭০৪ থেকে

১৭২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। উল্লিখিত তথ্য মতে বলা যায় যে অঞ্চলটি রাজশাহী নামে অভিহিত হয় ১৭০৪ থেকে ১৭২৫ সালের যে কোনো সময়ে। তবে ভূ-মানচিত্রে রাজশাহী নামটি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করা যায় ১৭৭৬ সালে রেনেলের মানচিত্রে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমানের মতে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বিভাজিত চাকলাগুলোর মধ্যে রাজশাহী চাকলা নামে আদৌ কোনো চাকলা ছিলো বলে তিনি স্বীকার করেননি। যদিও গবেষক এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রামাণ্যের অবতারণা করেননি। তিনি মনে করেন *রাজা* বা *রাজ* শব্দটির সাথে *শাহী* যুক্ত হয়ে রাজশাহী নামের উৎপত্তি এবং রাজা উদয়নারায়নের জমিদারির সময় থেকেই এই নামটির প্রচলন।[৫]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের ইলিয়াস শাহী সুলতান সাইফুদ্দিন হামযা শাহকে উৎখাত করে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ (কংস) এই অঞ্চলের অধিপতি হন। পরবর্তীতে তিনি রাজাশাহ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যই এই অঞ্চলের নাম হয়েছে রাজশাহী। ১৭১৪ সালে উদয় নারায়ণের জমিদারীর পদ্মা নদীর উত্তর অংশের ভূ-সম্পত্তির রাজশাহী চাকলা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয়। রামজীবনের জমিদারীও রাজশাহী জমিদারী নামে পরিচিতি পায়। জমিদার উদয় নারায়ণের জমিদারী পরিচালনায় সন্তুষ্ট হয়ে মুর্শিদকুলী খান তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৭৬৪-৭৬ সালে রেনেলের মানচিত্রে রাজশাহী শব্দটি পরিলক্ষিত হয়। যার ইংরেজী বানান RAUJESHY।[৬] ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও ঔপনিবেশিক প্রশাসক উইলিয়াম উইলসন হান্টারের (William Wilson Hunter) দেয়া তথ্যানুসারে পদ্মা নদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে একটি ভূ-ভাগ এই জেলার অন্তর্গত ছিল। যা বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জেলার সাথে সংযুক্ত যেমন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। ইতিহাসবিদদের ধারণা হিন্দু রাজা, জমিদার এবং মুসলিম শাসকগণ এলাকাটি শাসন করেছেন বলে রাজশাহী নামকরণ হয়েছিল। কারো কারো মতে, ভাতুরিয়ার হিন্দু রাজা গণেশ এবং তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন নামে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'শাহ' নাম গ্রহণের পর অঞ্চলটির নাম হয় রাজশাহী। অর্থাৎ হিন্দু রাজার 'রাজ' এবং ফারসি শব্দ 'শাহী' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে রাজশাহীর সৃষ্টি হয়। রাজশাহী নামকরণের ক্ষেত্রে যে মতবাদগুলো পাওয়া যায় তা জনশ্রুতিমূলক, গবেষণালব্ধ নয়। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন সংস্কৃত *রাজ* এবং ফার্সী *শাহী* শব্দ দুটি সম্মিলনে যে রাজশাহীর নামকরণ হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ উভয় শব্দের অভিন্ন অর্থ বিধায় এরূপ ধারণাকে অস্বীকার করেছেন।[৭] অন্যত্র দেখা যায় বীরভূমের রাজা উপাধিধারী মুসলমান রাজাগণের নাম অনুসারে রাজশাহী নামের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে শাহী রাজা মানসিংহের এবং রাজাশাহ গণেশের প্রসঙ্গটিও কেউ কেউ উল্লেখ করেন।[৮] গবেষক রহমানের মতামতকে আংশিকভাবে স্বীকার করেছেন কোনো কোনো গবেষক। তারা ধারণা পোষণ করেন রাজা উদয়নারায়ণের রাজশাহী জমিদারি নাম থেকেই রাজশাহী শহরের নামকরণ।[৯] উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নওয়াব মুর্শিদকুলী খান প্রবর্তীত চাকলাগুলোর মধ্যে যদি রাজশাহী চাকলা নামে কোনো চাকলার সন্ধান মিলে তবে নবাব মুর্শিদকুলী খানই *রাজশাহী* নামের প্রবর্তক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। তবে নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমলে এই অঞ্চলের নামকরণ যে রাজশাহী হয়েছে সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। কারণ রাজা উদয়নারায়ন মুর্শিদকুলীর শাসনামলেই রাজশাহীর জমিদার ছিলেন। নামকরণের এই বিতর্ক সমাধানে পৃথক কোনো গবেষণার আবশ্যক বলে মনে করি। আমরা জানি রাজশাহী শহরের প্রাচীন নাম ছিল মহাকালগড়। মহাকালগড় কালক্রমে রামপুর-বোয়ালিয়া নামে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ রামপুর-বোয়ালিয়ার পরিবর্তিত নাম 'রাজশাহী'। ইতিহাস দৃষ্টে লক্ষণীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেই রামপুর-বোয়ালিয়া বাণিজ্যিক শহর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ওলন্দাজ বণিকগণের রেশম ব্যবসা কেন্দ্র চালুর মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে ফরাসি এবং ইংরেজ বণিকগণ রেশম ও নীল ব্যবসার নিমিত্তে ওলন্দাজ বণিক কর্তৃক স্থাপিত কুঠিবাড়িগুলো দখল ও নতুন নতুন কুঠি স্থাপনপূর্বক রেশম ও নীল চাষ সম্প্রসারণ করে। কালক্রমে মহাকালগড় নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে 'রাজশাহী' নামে অভিহিত হয়।

রাজশাহী জেলার ভৌগোলিক বিবর্তন:

রাজশাহী জেলাটির ২৪°.০৬′ হতে ২৫°.১৩′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°.০২′ হতে ৮৯°.২১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১০] বাংলার প্রশাসনিক ক্রমবিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সাদ উল্লাহ খানের 'চাকলা' মুর্শিদকুলী খানের জমিদারি কোম্পানি আমলে রূপান্তরিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র জেলায়।[১১] লক্ষ করা যায় মূলত রাজস্ব আদায় এবং শাসন অভিপ্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিয়াশীল ছিল শাসকদের এই প্রশাসনিক ক্রমবিবর্তনের। নবাব মুর্শিদকুলী খান ১৭৭২ পরবর্তী সময়ে বাংলার ১৩টি চাকলাকে ২৫টি জমিদারিতে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে রাজশাহী ছিল অন্যতম জমিদারি।ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানি কর্তৃক দিওয়ানি লাভের পর অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পরগণা বা জমিদারি কেন্দ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাকে পরিহার পূর্বক ব্রিটিশ প্রথাভিত্তিক জেলা ব্যবস্থায় উত্তীর্ণের প্রয়াস নেয়া হয়। গবেষকের মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার জেলাগুলোকে তাদের প্রশাসনের আঞ্চলিক ইউনিট রূপে গড়ে তোলেন।[১২]

ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর আদলে পরগণাকে জেলায় রূপান্তরিত করে তার রাজস্ব আদায় নিমিত্তে প্রতিটি জেলায় নিযুক্ত হয় একজন কালেক্টর। যাদের মূল দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। এ সকল কালেক্টরগণ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এর সময়ে। জানা যায় তৎকালীন রাজশাহী জেলার আয়তন মুর্শিদকুলী খানের রাজশাহী জমিদারির আয়তনেরই অনুরূপ ছিল।[১৩] যার আয়তনিক পরিসংখ্যান লক্ষ করা যায় ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রতিবেদনে। অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস এর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সে রিপোর্টে লক্ষ করা যায় তৎকালীন রাজশাহী জেলার আয়তন ছিল ১২৯০৯ বর্গমাইল এবং ১৩৯টি পরগণার সমন্বয়ে বিস্তৃত।[১৪] হেস্টিংস তৎসময়ে রাজশাহী অঞ্চলকে সমন্বিত প্রশাসনিক অঞ্চলে অর্ন্তভুক্ত করেছিলেন। বর্তমান রাজশাহী জেলা, নাটোর জেলা, পাবনা জেলার আংশিক, নওগাঁ জেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা, (মালদহের দক্ষিণাংশসহ) এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণাংশ অঞ্চল তৎকালীন রাজশাহী জেলার অর্ন্তভুক্ত ছিল।

১৮১৩, ১৮২১, ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে পাবনা, বগুড়া ও মালদহ জেলার স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের ফলে রাজশাহী জেলার বৃহৎ আয়তন অনেকটা সংকোচিত হয়। রাজশাহী জেলার ভৌগোলিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। নানা সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এ জেলার আয়তন নির্দিষ্ট হয় ২৬১৮ বর্গমাইলে। তৎসময়ের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১৪,৮০,৫৮৭ জন।[১৫] ১৯১২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজশাহী জেলার এ আয়তনের বা ভৌগোলিক সীমারেখার বিবর্তনের দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায় না। এ সময়ে মালদহ জেলা, দিনাজপুর জেলা বগুড়া জেলা এবং পাবনা জেলা, রাজশাহী জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা হিসেবে স্থিত ছিল।

রাজশাহী নামক প্রাচীন এ জনপদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য না পাওয়া গেলেও ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি, সিরাজগঞ্জের নিমগাছিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা শিলালিপি, মাধাইনগরে (রায়গঞ্জ) প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির অর্ন্তগত ছিল রাজশাহী জেলা। এই জেলাটি ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন হবার পূর্বে কয়েক শতকব্যাপী পর্যায়ক্রমে মৌর্য, শৃঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন শাসন এবং গৌরবঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি বাংলার স্বাধীন সুলতান এবং মুঘলদের শাসনাধীন। তবে সবসময় একইরকম ভাবে প্রত্যক্ষ শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রাচীন ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, মৌর্য শাসনের পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্র নামে এক সমৃদ্ধ জনপদ। রাজশাহী জেলা ছিল ঐ বরেন্দ্র জনপদের অন্তর্গত একটি অঞ্চল বিশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত সম্রাট শ্রী গুপ্তের শাসনামলে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বেশ কটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কাশীনাথ দীক্ষিত তাঁর ১৯২২'-২৩ সালে

প্রকাশিত 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এনুয়াল রিপোর্ট-এ এতদঞ্চলে একটি প্রাচীন নগরীর উল্লেখ করেছেন সম্ভবত সেই প্রাচীন নগরী গুপ্ত আমলেই বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

বিখ্যাত তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তাঁর *'ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার' গ্রন্থে এই অঞ্চলে যে কারুপল্লী (Artisans guild)-র উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত সেই কারুপল্লী এই রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার মাণ্ডৈল কিংবা দেওপাড়ায় অবস্থিত ছিল।* বরেন্দ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমায় অবস্থিত এলাকাটি পরবর্তীতে এসে কিভাবে রাজশাহী নামে ভৌগোলিক পরিচয়ে পরিচিত হলো সে সম্পর্কে সঠিক তেমন তথ্য জানা যায় না। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের সময়ও রাজশাহী ছিল অবিভক্ত জেলা। অর্থাৎ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এই ৪টি মহকুমার সমন্বয়ে বিস্তৃত। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য রাজশাহী জেলাটিকে চারটি মহকুমায় পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ সময় জেলাটির আয়তন বৃদ্ধি না পেলেও মৌজা পর্যায়ে কিছুটা সীমানা পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে তৎকালীন সরকার জেলা পুনগঠন অধ্যাদেশের আওতায় সকল মহকুমাকে জেলায় উত্তীর্ণ করলে নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর স্বতন্ত্র জেলায় রূপান্তরিত হয়।

প্রশাসনিক কাঠামোর বিবর্তন: রাজশাহী মহানগরী ভৌগোলিকভাবে ২৪°২২´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মহানগরীটির আয়তন নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। রামপুরা-বোয়ালিয়া থানা হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর আয়তন ছিলো ১১৪ বর্গমাইল। যদিও উক্ত পরিসংখ্যানে শহরের আয়তন পৃথকরূপে উল্লিখিত হয়নি। ২০০১ সালের পরিসংখ্যানে লক্ষ করা যায় সিটি কর্পোরেশন হিসেবে রাজশাহীর আয়তন ৯৬.৬৯ বর্গকিলোমিটার। আবার ২০১১ সালে রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিসংখ্যান এর আয়তন হিসেবে উল্লেখ করে ৯৭.১৮ বর্গকিলোমিটার।[১৬] অপরদিকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যানে লক্ষণীয় ৯৬.৭২ বর্গকিলোমিটার। তবে উক্ত আয়তনের মধ্যে ৪৮.০৬ বর্গকিলোমিটার প্রকৃত মহানগরী হিসেবে উল্লিখিত। অবশিষ্ট ৪৮.৬৬ বর্গ কিলোমিটার নদীগর্ভে নিমজ্জিত রূপে উল্লিখিত উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে।[১৭]

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় রাজশাহী মহানগরী মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে ১ এপ্রিল ১৮৭৬ সালে। তৎসময়ে বাংলার ডিপোটি গর্ভনর ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পলের। ১৯৬০ সালে মিউনিসিপ্যালিটিকে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে রূপান্তর করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। আবার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি বা পৌর কমিটিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত করে রাজশাহী পৌরসভা। এরশাদ সরকার তার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের আওতায় রাজশাহী পৌরসভাকে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনে উন্নীত করেন। ১৯৯০ সালে "পৌর" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয় "সিটি" শব্দটি। অর্থাৎ রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন রূপ নেয় 'রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে'। ইতিহাস দৃষ্টে লক্ষণীয় ১৯৮৭ সালে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের যে সীমানা নির্ধারণ করা হয় সে সীমানা নিয়েই পরিচালিত বর্তমান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। তবে ২০০৪ সালের এক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নবীনগর মৌজার বুলনপুর, বিডিআর ক্যাম্প এলাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বা মহানগীরর সীমানা পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায় এর চার দিকে প্রায় অধিকাংশ এলাকাই পবা উপজেলার। উত্তরে মৌজা হড়গ্রাম, বড়বন গ্রাম, মেহেরচন্ডী এবং নবীনগরের বিডিআর ক্যাম্প। দক্ষিণে সুবিশাল পদ্মানদী। পূর্বে মৌজা বুধপাড়া, মির্জাপুর এবং ডাঁশমারী। পশ্চিমে মৌজা গোয়ালপাড়া এবং হাড়ুপুরের অংশ বিশেষ।[১৮] বর্তমানে ৩০টি ওয়ার্ড এবং ১৩৪টি মহল্লার সমন্বয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন গঠিত। ২০১১ সালের আদমশুমারীর খসড়া তথ্য মতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্যা ৪,৫৩,৯৬৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ২,৩৩,১৭৯ জন এবং নারী ২,২০,৭৮৭ জন। যদিও রাসিকের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৮,৫১,৬৬৯ জন। শিক্ষার হার ৭১.২২ শতাংশ।[১৯]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভারত বর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে। যেমন: প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তানি শাসনামল এবং ৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ। রাজশাহীর শিক্ষা ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। পাল ও সেন আমলে অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রাজশাহী জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রধানত বিহার ও মহাবিহার কেন্দ্রিক। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মহাবিহারগুলো অনেকটা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল এ সকল শিক্ষায়তনের পঠিত বিষয়। পরবর্তীতে শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠে গুরুগৃহ ও চণ্ডী মণ্ডপ, যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী সময় থেকে অর্থাৎ সুলতান ও মুঘল আমলে মাদ্রাসা কেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে অঞ্চলটিতে। মুসলমান ও অমুসলিম পণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষাদানের সুযোগ পেতেন। এক্ষেত্রে সুলতান নুসরাত শাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রাজশাহীর বাঘায় বিখ্যাত একটি মক্তব মাদ্রাসা ও খানকা গড়ে তোলেন। এসব খানকা আরবী, ফারসি, কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দেওয়া হতো। এতদ্ব্যতীত প্রজাহৈতেষী জমিদারগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। যেখানে বাংলা, সংস্কৃত, গণিত, ব্যাকরণ প্রভৃতি জ্ঞানদান করা হতো।

রাজশাহী জেলার শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ইংরেজদের স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলো। এই অঞ্চলে ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলো হচ্ছে-বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজশাহী জেলায় প্রথম ইউরোপীয় শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজ ১৮৭৩ সালে। রাজশাহী লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৪৭, রাজশাহী মাদ্রাসা ১৮৭৪, পিএন উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৮৬, রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৮৪, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩, শিক্ষক শিখন কলেজ ১৯৫৩, মেডিকেল কলেজ ১৯৫৫, রাজশাহী সিটি কলেজ ১৯৫৮, লক্ষিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৬০, রাজশাহী অন্ধ স্কুল ১৯৬২, মহিলা কলেজ ১৯৬২, টেকনিক্যাল কলেজ ১৯৬২, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর হাসপাতাল ১৮৬৫, সংস্কৃত কলেজ ১৯০৬, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ১৯১০, সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয় ১৯২৮, রাজশাহী মূক ও বধির বিদ্যালয় ১৯৩১ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাজশাহী মহানগরীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাভিত্তিক হিসাব করলে পাওয়া যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৭টি, বেসরকারি ১৭টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৩টি, কিন্ডার গার্ডেন ৭২টি, রাসিক ইএলসিডি প্রকল্পের এসবিকে অ্যান্ড প্রিস্কুল ২১টি, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ৩টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি ৬টি, বেসরকারি ৩৭টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৮টি, সরকারি কলেজ ৬টি, বেসরকারি ১৫টি, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট ৩টি, কারিগরি/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২৩টি, ফাজিল ও দাখিল মাদ্রাসা ৭টি, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ৯টি, সরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ২টি, বেসরকারি ৮টি, সরকারি প্রতিবন্ধী স্কুল ১টি ও বেসরকারি ৪টি। এতদ্ব্যতীত বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি ২টি, বেসরকারি ১৭টি। বর্তমানে রাজশাহী মহানগরী শিক্ষা নগরী রূপে খ্যাত। এখানে শিক্ষার হার ৭১.২২ শতাংশ সরকারি, আধাসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তাদের সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১৫টি এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০টি সহ মোট ৩২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পরিচালিত রাজশাহী মহানগরীর শিক্ষা কার্যক্রম।[২০] এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুমানিক দুই লাখ শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত। যাদের সীমিত সংখ্যক স্থানীয় এবং সিংহভাগ বহিরাগত।

বিভিন্ন পেশাজীবী: তৎসময়ে রাজশাহী জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত কৃষি নির্ভর। আঞ্চলিক বাজারভিত্তিক এবং সীমিত শিল্পোন্নয়ন নির্ভর ছিল। ১৯৪৭ সালে পরবর্তী রাজশাহী জেলায় অর্থনীতি পাকিস্তান সরকারের অনেকটা অনাগ্রহের মধ্যেই স্থিত ছিল। যার ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো রাজশাহীর অর্থনীতির

অগ্রগতি ছিল অনেকটা দুর্বল ও সংকটাপন্ন। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্রভূমির অংশ ছিল বলে জানা যায়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন প্রাচীনকালের রাজশাহী শুধুমাত্র কৃষি ও হস্ত শিল্পের প্রতি নির্ভরশীল ছিল। মধ্যযুগে রাজশাহীর অন্যতম শিল্প হিসেবে পরিচিতি পায় রেশম শিল্প। এই রেশম বাণিজ্যের জন্যই পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা রাজশাহীর বোয়ালিয়ার বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা কুঠির স্থাপন করে। রাজশাহীর দরগাপাড়ায় নির্মিত বড় কুঠির এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ডাচ ইন্ডিয়ান কোম্পানী দ্বারা এটি নির্মিত হয় ১৭৮১ সালে। পরবর্তীতে ইংরেজ ও ডাচদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রাজশাহীতে রেশম শিল্পের অগ্রগতি সাধিত হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৮০০ সালের মধ্যে রাজশাহী জেলাতেই ১৫০টি নীল কুঠির বা কারখানা ছিল। জেলা সদর নাটোর থেকে রাজশাহীতে ১৮২৫ সালে স্থানান্তর হলে রাজশাহী শহরে তাঁতশিল্প, ধাতব শিল্প, কাঠের কাজ এবং মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটে। দেশ বিভাগের পর রাজশাহী অঞ্চলে কয়েকটি পাঠ ও চিনির কল ব্যতীত তেমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি।

শিল্প কারখানা: রাজশাহী জেলার কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় প্রধানত কৃষি ও কুটিরশিল্প কেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী পেশায় নিযুক্ত ছিলো রাজশাহী জেলার সাধারণ মানুষ। পরবর্তী সময়ে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পেশাজীবীর বিকাশ ঘটে। কৃষক, কুমার, মৃৎশিল্পী, খামার শ্রমিক, তাঁতী, রেশম চাষী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষের বসবাস ছিল তৎকালীন রাজশাহী জেলায়। জেলা সদর স্থানান্তর, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধাতব চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে রাজশাহী জেলায় চাকরীজীবী শ্রেণির যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি প্রসার ঘটে ব্যবসায় শ্রেণির। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ১৯৯টি, খামার ৪টি, রেশম, পাট, টেক্সটাইলের ভারী শিল্প ৫টি, ধান, আটা, তেল, মরিচসহ প্রভৃতির মিল ৫৩টি।[২১]

রাজশাহী মহানগরী এক সময় রেশম ও নীল চাষের জন্য বিখ্যাত ছিলো। বর্তমানে নীলচাষ বিলুপ্ত এবং রেশম চাষও বিলুপ্তির পথে। কৃষির পরিবর্তে নগরায়নের দিকে ধাবিত মহানগরটি। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় বর্তমানে ৪৮ শতাংশ ভূমি গৃহ ও নগরায়নের কাজে ব্যবহৃত এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র ১৮.৭ শতাংশ ভূমি।[২২] কৃষির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় শস্য অপেক্ষা ফলের বাগানের প্রতিই অধিক উৎসাহী এলাকাবাসী। সম্ভবত এ অঞ্চলের মাটি অধিক সেচ নির্ভর হওয়ায় শস্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ কম। ফলে কৃষি অপেক্ষা অন্যান্য পেশায় নগরবাসীর আগ্রহ অনেক বেশি। মহানগরীতে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের পরিসংখ্যানটি উল্লেখ করলে দেখা যায় কৃষিতে শতকরা ৫ জন, নির্মাণ শ্রমিক ৪ জন, ব্যবসা বাণিজ্যে ২৬ জন, যোগাযোগ শ্রমিক ১০ জন, চাকুরীজীবী ৩৪ জন এবং অন্যান্য পেশায় শতকরা ১৬ জন।[২৩] উল্লিখিত পরিসখ্যান থেকে সহজেই প্রতীয়মান ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরি কেন্দ্রিক রাজশাহী মহানগরীর মূল অর্থনীতি। অর্থাৎ মহানগরীটিতে মোট পেশাজীবীর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ পেশাজীবী ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসার মধ্যে ভারী শিল্পের প্রসার এখানে ঘটেনি। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। যা মূলত রেশম, পাট বিভিন্ন খাদ্য পণ্য ও আসবাবপত্র কেন্দ্রিক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের খাবার হোটেল, দোকান ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও উপাদান সমন্বয়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাগুলো। এ ব্যবসা বাণিজ্যগুলো স্থানীয় নগরবাসী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত শিক্ষার্থী, বিভিন্ন চাকুরীজীবীদের প্রাত্যাহিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। তবে ক্ষুদ্র এ ব্যবসাগুলো উল্লেখযোগ্যহারে নির্ভরশীল শিক্ষার্থীদের উপর। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘকালিন বন্ধে এ ক্ষুদ্র ব্যবসায় যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিনোদন: বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত রাজশাহীর বাসির বিনোদন সম্পন্ন হয়েছে মূলত গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহীর সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই। বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ মেলা, ঐতিহ্যবাহী নানা নাট্যাঙ্গিক, নৌকা বাইচ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই

অঞ্চলে অনেক আধুনিক বিনোদনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যেমন: চলচ্চিত্র, বেতার, পার্ক ও উদ্যান ভ্রমণ প্রভৃতি। বিনোদন কেন্দ্রিক মাঠ, স্টেডিয়াম, ক্রীড়া কমপ্লেক্স ও মঞ্চের মধ্যে ক্রীড়া কমপ্লেক্স ৮টি, খেলার মাঠ ৪১টি, প্রসেয়নিয়াম মঞ্চ ৮টি, মুক্ত মঞ্চ ৩টি, কেন্দ্রীয় উদ্যান-১টি, শিশুপার্ক-৩টি, মেলার মাঠ ৩টি।[২৪]

ধর্মচর্চা: রাজশাহী জেলায় বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার সম্মিলন ও বিবর্তনের বিচিত্র সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজা-অর্চণার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন লোকায়ত বিশ্বাসে সূচনা ঘটেছে এ অঞ্চলের ধর্মচর্চা। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ৪র্থ থেকে ১২শ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দু ধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র ভূমিতে। আবার পাল শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে ব্যাপকভাবে। ১৩শ শতক অর্থাৎ গৌড়ে মুসলমান শাসকদের আগমনে বৌদ্ধ বিহারগুলো যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি ইসলাম ধর্মচর্চার প্রসার ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিত অঞ্চলে মসজিদ, মাদরাসা, সুফি খানকাসহ নানা ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ধর্মপ্রচার ও প্রসারের অভিপ্রায়ে। এক্ষেত্রে সুফি, পীর, আউলিয়া ও সাধকদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে এ সম্প্রদায়টি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত হয়। রাজশাহী জেলার ধর্মচর্চার ইতিহাসে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্মালম্বীরা অতিশয় নিম্নমানের জীবন যাপন করতেন। মুসলমান হয়েও হিন্দু রীতি-নীতির অনুশাসনেই তাদের জীবন যাপন করতে হত। ধর্মীয় আচারণ পালনে মুসলমানগণ এতটাই ভীরু ছিলেন যে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা'য় গরু কোরবানি করতে পর্যন্ত সাহস পেত না।[২৫]

রাজশাহী অঞ্চলে মুসলিম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ১৩শ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গভূমিতে পির, দরবেশদের আগমন ঘটতে থাকে ব্যাপকভাবে। এসব পির, দরবেশদের মধ্যে রাজশাহী জেলায় ধর্ম প্রচারত উল্লেখ্যযোগ্য পির ও দরবেশরা হলেন-হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.), হযরত তুরকান শাহ (রহ.), সৈয়দ করম আলী শাহ (রহ.) হযরত দিলাল বোখারী (রহ.), হযরত শাহ আব্বাস (রহ.), হযরত শাহ সুলতান (রহ.), মুল্লক জাহান, মোকাররম শাহ, পির গহর উদ-দীন, সদর উদ-দীন, ঝনঝনিয়ার পির, সদাই ফকির, দরবেশ শাবুদরশাহ, গিয়াস উদ-দীন, সামমুদ্দীন, সিকেন্দার, কালু ও গাজী (পঞ্চ পির) বলিয়া সাহেব, হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ প্রভৃতি সুধি সাধকগণ। জানা যায় রাজশাহী জেলার প্রত্যেক থানায় কোনো না কেনো না স্থানে একাধিক পিরের সমাধি বা দরগার সন্ধান মিলে।[২৬] অন্যত্র সনাতন ধর্মের অন্য আকের ধারা বৈষ্ণব ধর্মমতেরও প্রচলন ঘটে ছিল এই অঞ্চলে। এক্ষেত্রে নরোত্তম ঠাকুরের প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রাজশাহী অঞ্চলে মুসলমান সমাজে পুঞ্জিভূত কুসংস্কার নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওয়াহাবী ধর্মমত। সপুরাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই ধর্মমত রাজশাহীতে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। উক্ত সময়ে মৌলানা বিলায়েত আলী, শহীদ আহমদ হোসেন ব্রেলবীর, আবুবকর সিদ্দিকী, মৌলনা রুহুল আমীন, মৌলনা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, মৌলবী ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মুনশী মেহেরুল্লা, আব্দুল্লা হেল কাফীসহ নানা সুফী, পির ও বুজর্গদের প্রয়াসে রাজশাহীর ধর্মীয় অঙ্গনে নবযুগের সূচনা হয়।[২৭] বর্তমান রাজশাহীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-মসজিদ ৩৪০টি, ঈদগাহ ৬২টি, মন্দির ৬৫টি, পূজামণ্ডব ৩০টি, গির্জা ৫টি অন্যান্য উপসনালয় ১৬টি।[২৮]

বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও নানা আন্দোলন-সমাবেশে রাজশাহী মহানগরীর ঐতিহ্য স্মরণযোগ্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসহ সকল স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে রাজশাহীবাসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জাতীয় রাজনীতিতে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকলেও ব্যক্তি, ক্ষুদ্র সংগঠন ও সমিতি কেন্দ্রিক নানা কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্য রাজশাহী শহরে প্রথম গঠিত হয় *অনুশীলন সমিতি* (১৯১১-১২)। এটি ছিলো বিপ্লবীদলের একটি শাখা। আবার এ অঞ্চলের মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *চরকা সমিতি*। এতদ্ব্যতীত ওহাবি আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন দ্বারা রাজশাহী বেশ প্রভাবিত ছিল। মুসলিমলীগে আব্দুল হামিদ মিয়া, মাদার বখশ এবং হাজী লাল মোহাম্মদ সাহেবের সক্রিয় সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠে। ব্রিটিশ শাসন অবসানে বাংলাদেশ তথা পূর্বপাকিস্তানের জন্য শুরু হয় নতুন সংকট। সৃষ্ট নানা সংকটের প্রথম জাতীয় বহি:প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এই আন্দোলনের সাথে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় দেশব্যাপী ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। যেখানে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন ও স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সকল সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে যায়। এর নিকটতম প্রেক্ষাপট হিসেবে নানা ঘটনা, দুর্ঘটনা ও ষড়যন্ত্রের ফলাফল ২৬ মার্চ ১৯৭১। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সমাপ্তি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। অতঃপর বাঙালির কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

উপসংহার

রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক পটভূমি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পরিচয় নয়, তা একটি প্রাচীন জনপদের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক নানা বিবর্তনের প্রামাণ্য দলিল। অভিজাত ও ঐতিহাসিক নামকরণের মধ্যদিয়ে রাজশাহী জেলা স্বীয় গৌরবে স্বতন্ত্র। প্রশাসনিক বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে লক্ষণীয় বৃহত্তর রাজশাহী সর্বদাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বঙ্গের বিভিন্ন শাসকদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত ছিল। শিক্ষা শিখনের ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিচিত্র মেলবন্ধন, ধর্মচর্চার অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, নৌপথের উন্নত ও সমৃদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করেছে রাজশাহী নগরী। ফলে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ এবং ইংরেজী বণিকরা বারবার গুরুত্বের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে অঞ্চলটিতে। বৌদ্ধবিহার, রাজশাহী কলেজ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালসহ নানা প্রত্ননিদর্শনের সমন্বয়ে রাজশাহী একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে বিবেচিত হয়। পদ্মাবিধৌত এই জনপদের ইতিহাস আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক এক অঞ্চলের কথা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ *বাংলাদেশের জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর রাজশাহী*, প্রধান সম্পাদক, নূরুল ইসলাম খান (ঢাকা: সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), ২।

২ কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান-রাজশাহী শহর ও তার নামকরণ: একটি পর্যালোচনা "রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান- প্রথম খন্ড" (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আই.বি.এস, ২০১২), ৬০।

৩ Ibid.

৪ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড), (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশ, ২০১৪), ২৫।

৫ কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, *রাজশাহী শহর ও তার নামকরণ: একটি পর্যালোচনা*, 'রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান' (প্রথম খণ্ড), সম্পা. মো. মাহবুবর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), ৬৮।

[৬] কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, মুশফিক আহমদ, নূরুল হোসেন চৌধুরী, *রাজশাহী শহরের নামকরণের ইতিহাস*, 'বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৫ বছর', প্রধান সম্পাদক প্রফেসর রুহুল আমিন প্রামানিক (রাজশাহী: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১১), ১৮৫।

[৭] এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯), ১।

[৮] *বাংলাদেশের জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর রাজশাহী*, ১-২।

[৯] আনারুল হক আনা, *রাজশাহী মহানগরীর কথা* (রাজশাহী: আনিকা-আস-আদ প্রকাশনী, ২০০৪), ১১।

[১০] নূরুল ইসলাম খান, ed., *বাংলাদেশের জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর রাজশাহী* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১), ১।

[১১] মাহবুব সিদ্দিকী, *অবিভক্ত রাজশাহী জেলা ও বিভাগ গঠন প্রশাসনিক ক্রমবিকাশ*, (রাজশাহী: হেরিটেজ রাজশাহী, ২০০৩), ১৭।

[১২] Ibid.

[১৩] Ibid., ২৩

[১৪] Ibid., ২৩-২৪

[১৫] Ibid., ৩৯

[১৬] আনারুল হক আনা, *রাজশাহী মহানগরীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, 'বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর', প্রধান সম্পাদক প্রফেসর রুহুল আমিন প্রামানিক (রাজশাহী: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১১), ১১।

[১৭] Ibid., ১১।

[১৮] আনারুল হক আনা, *রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন: উদ্ভব, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবলী*, 'রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান' (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক মো. মাহবুবর রহমান, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), ৩২-৩৫।

[১৯] আনারুল হক আনা, *এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*, বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর, ৬৭।

[২০] আনারুল হক আনা, *এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*, বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর, ৬৮।

[২১] আনারুল হক আনা, *এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*, বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর, ৬৮।

[২২] মো. রেদওয়ানুর রহমান, *রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশ*, 'রাজশাহী মহানগরীর: অতীত ও বর্তমান' (প্রথম খণ্ড), (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), ।

[২৩] রহমান, *রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশ*, 'রাজশাহী মহানগরীরর: অতীত ও বর্তমান', (প্রথম খণ্ড), ১০৯।

[২৪] আনারুল হক আনা, *এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*, বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর, ৬৮।

[২৫] কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড), ২৬১।

[২৬] Ibid., ৩৫৩।

[২৭] Ibid., ৩৫৭।

[২৮] আনারুল হক আনা, *এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন*, বরেন্দ্রের বাতিঘর অগ্রযাত্রার ৩ বছর, ৬৭-৬৮।